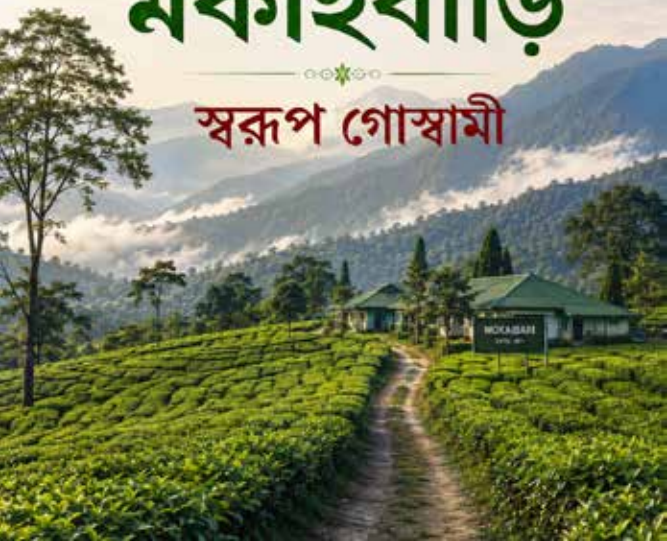


তোমার বাড়ি
আমার বাড়ি

মকাইবাড়ি মকাইবাড়ি

স্বরূপ গোস্বামী



তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি মকাইবাড়ি মকাইবাড়ি

স্বরূপ গোস্বামী



বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০২৬

যোগাযোগ
বেঙ্গল টাইমস
কেবি ১২, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬

ফোন
৯৮৩১২২৭২০১
ই-মেল

bengaltimes.in@gmail.com

উৎসর্গ

সঞ্জয় মুখার্জি

জীবনের অর্ধেকটা সময় পাহাড় ও চা-
বাগানেই কাটিয়ে দিল।

পৃথিবীর সেরা চা তার হাতেই তৈরি হয়েছে
বহু বছর।

এমন বন্ধুর জন্য গর্বও হয়, আবার ঈর্ষাও হয়।

সবিনয় নিবেদন

উঠল বাই, পাহাড় যাই। নেশাটা সেই কবে থেকে ধরেছে, বলা মুশকিল। এই হাফ সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় এসেও নেশাটা কমেনি। বরং দিনদিন বেড়েছে। এখনও দুদিন ছুটি পেলেই মনে হয়, একটু পাহাড় চরে আসি।

বাঙালি পাহাড় বলতেই বোঝে দার্জিলিং। তারপর সেই চেনা রুট। ফাইভ পয়েন্ট, সেভেন পয়েন্ট। এই দার্জিলিংয়ের আনাচে কানাচে কত রহস্যে মোড়া রাস্তা, মেঘের আন্তরণ সরিয়ে কোথাও একটা পুরনো গির্জা। বা পরিত্যক্ত বাংলো। কত অজানা ইতিহাস। কিন্তু বাঙালি সে পথ মাড়ায় না। সে চেনা পথেই ঘুরপাক খায়।

কেন জানি না, ছোট থেকেই অন্য একটা পাহাড়কে

চিনে এসেছি। যেখানে তথাকথিত পর্যটকের পা পড়ে না। দার্জিলিং কতবার গেছি, মনে নেই। ইচ্ছে করেই চেনা ঠিকানাগুলো এড়িয়ে চলি। পায়ে হেঁটে উদ্দেশ্যবিহীন, ঠিকানাবিহীন সেই সফরের রোমাঞ্চ অনুভব করি। প্রতিবার যেন নতুন রূপে ধরা দেয়। কিন্তু তারপরও পাহাড় মানে আমার কাছে দার্জিলিং নয়। আশপাশে ছড়িয়ে থাকা সুন্দর গ্রামগুলো। কর্মসূত্রে অনেকটা সময় কেটেছে উত্তরবঙ্গে। তখন পাহাড়কে ভালবাসা যেন আরও বেড়েছে। তখন তো একবেলার ফুরসত পেলেই চলে যেতাম কোনও পাহাড়ি গ্রামে। ইদানীং সেইসব গ্রাম একটু একটু করে পরিচিতি পাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও হোম স্টের নামে গজিয়ে উঠছে আখান্না ইমারত।

পাহাড় নিয়ে কত লেখা লিখেছি, তার হিসেব রাখা মুশকিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেমন বেরিয়েছে, তেমনই বেশ কয়েকটি সংকলনও দিনের আলো দেখেছে। এবারের সংকলন মূলত চা-বাগান কেন্দ্রিক

এলাকা নিয়ে। সব যে হাতে গরম টাটকা লেখা, এমন নয়। যেমন, বইয়ের শিরোনাম, ‘তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি, মকাইবাড়ি, মকাইবাড়ি’। এই মকাইবাড়িতে প্রথম যাই দুই দশক আগে। যাঁকে এই বই উৎসর্গ করা, সেই সঞ্জয় তখন সেখানেই ছিল। তাঁর সৌজন্যে বেশ কয়েকবার সেই বাংলায় থাকার সুযোগও হয়েছিল। আরও ভাল করে চেনার সুযোগ হয়েছিল এই হেরিটেজ বাগানকে। আন্তর্জাতিক স্তরে বাঙালি হাতে গোনা যে কয়েকটা বিষয়ের জন্য গর্ব করতে পারে, সেই তালিকায় একেবারে সামনের সারিতেই থাকবে মকাইবাড়ির চা। পৃথিবীর অন্যতম সেরা চা। আমার কাছে এর তৃপ্তি অন্যরকম। পৃথিবীর সেরা চা আমার বন্ধু বানায়। এ কী কম গর্বের!

মকাইবাড়ি নিয়ে এই লেখাটি বেশ পুরনো। অন্তত এক যুগ আগের তো বটেই। সঞ্জয়ও এখন আর মকাইবাড়িতে নেই। তিন পুরুষের বাগানের

মালিকানারও হাতবদল হয়েছে। চারপাশের অনেককিছুই হয়তো বদলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছে করেই লেখাটি অদল-বদল বা পরিমার্জন করিনি। যেমন ছিল, হুবহু তেমনই রেখেছি। লেপচাজগৎ, বাগোড়ায় প্রথম যাওয়া— তাও এক যুগ আগে তো বটেই। সেই সময়ের ছবিটাই ধরা আছে। কোনওটা হয়তো চিঠির মোড়কে, কোনওটা আবার ডায়েরির আদলে।

সবমিলিয়ে নিছক ভ্রমণ কাহিনি নয়, মিশে আছে ব্যক্তিগত অনুভূতিও। পাহাড় নিয়ে এরকম কুড়িটি সংকলন করলেও অসম্পূর্ণই মনে হবে। এত গ্রামে ঘোরার পরেও মনে হয়, কিছুই তো ঘোরা হল না। ঠিক তেমনই, অনেক লেখার পরেও মনে হয়, আসলে কিছুই লেখা হল না।

স্বরূপ গোস্বামী

তোমার বাড়ি আমার বাড়ি মকাইবাড়ি, মকাইবাড়ি

রাজাবাবু,

এ কোনও রাজার নিকট প্রজার চিঠি নয়। কিন্তু কী করব! আপনার নামই যে রাজা! রাজা ব্যানার্জি। আঁতলামি করে রাজাদা বলব, এমন ধৃষ্টতা যেন কখনও না আসে। অগত্যা, রাজাবাবু। এছাড়া আর কী বলেই বা সম্বোধন করতাম!

বেশ কয়েকবার আপনাকে দেখেছি। কখনও কাছ থেকে, কখনও একটু দূর থেকে, আবার কখনও অনেকটা দূর থেকে। কতবার ভেবেছি, এগিয়ে যাই, প্রণাম করি। ইচ্ছে হয়েছে, আপনার সঙ্গে আপনার বাগানে ঘুরে বেড়াই। শুধু চা নিয়েই আপনার সঙ্গে

ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করি। কী জানি, কী ভেবে নিজেকে বারবার গুটিয়ে নিয়েছি। আপনি তাই আমার কাছে দূর গ্রহের তারা হয়েই থেকে গেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় একবার বলেছিলেন, ‘বড় মানুষদের কাছে যেতে নেই। তারা অনেক ছোট হয়ে যায়।’ নিজের পেশাগত জীবনেও বহু গুণী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি। দেখেছি, কীভাবে তাঁদের ভাবমূর্তির দেওয়ালে চোখের সামনে পলেন্স্তারা খসে গেছে। মিলিয়ে নিয়েছি অন্নদাশঙ্করের এই কথার সারসত্য। আপনার সান্নিধ্যে এলে আপনিও কি আমার কাছে ছোট হয়ে যেতেন! শ্রদ্ধার ইমারত থেকে ইটগুলো কি খসে পড়ত! জানি না, জানার দরকারও নেই। আপনি প্রণম্য ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

আপনার বাগানে প্রথম যাই বছর চারেক আগে। বিশ্বাস করুন, তার আগে মকাইবাড়ি টি এস্টেটের কথা শুনলেও আপনার নাম কখনও শুনিনি।

দোষটা আপনার নয়, একান্তই আমার। নিজের এই অজ্ঞতার কথা ভাবলে এখন নিজেরই হাসি পায়। এমনকি প্রথম যেবার গেলাম, সেবার দু রাত থাকলেও আপনাকে নিছক একজন মালিকের বেশি কিছু ভাবিনি। সব বাগানেই একজন মালিক থাকে, আপনিও আছেন। এত আদিখ্যেতার কী আছে! বামপন্থী আবহে বেড়ে ওঠা, তাই শুরুতেই মালিক মানে শ্রেণিশত্রু ভেবে নেওয়ার একটা বদভ্যেস আছে। শুনেছিলাম, চার পুরুষের বাগান। আর তাই সরলীকরণ করে নিয়েছিলাম, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন। বিলাস আর বৈভবে কেটেছে তারুণ্য, যৌবন। আপনি হয়ত বড় লোকের বখাটে ছেলের মতোই। বাপ ঠাকুরদা রেখে গেছেন, আপনি হয়ত পায়ের ওপর পা তুলে আয়েস করে যাচ্ছেন। শুনলাম, আপনার পড়াশোনা সব লন্ডনে। তখনও তেমন সমীহ জাগেনি। বাপের টাকা থাকলে লন্ডনে পড়াশোনা করা কী এমন আহামরি ব্যাপার! মোদা কথা, সেবার আপনাকে ঘিরে আলাদা কোনও



অনুভূতি তৈরি হয়নি। আসলে, আপনার কর্মীদের সঙ্গে, এলাকার সাধারণ নেপালিদের সঙ্গে সেভাবে মেশার সুযোগই হয়নি। বাগানের বৃত্তান্ত জানারও তেমন অবকাশ হয়নি। শুধু পর্যটকের তকমা লাগিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে গেছি। মানতেই হবে, বাগানটা দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে দাগ কেটে যায়। সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে কার আর ইতিহাস কপচাতে ইচ্ছে করে! আর তখন জানার তেমন সুযোগও ছিল না। কারণ, আশেপাশে লোকাল গাইড বলে কেউ ছিল না। কলকাতা থেকে যাওয়া তিন আগন্তুক। কেউই কিছু জানি না। যাওয়ার আগে

পড়াশোনা করেও যাইনি। বাঙালির জীবনে তখনও গুগল সার্চের বা উইকিপিডিয়ার এতখানি চল ছিল না। জানার মধ্যে জেনেছিলাম, আপনার বাগানের চা তখনই নাকি বাইশ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হত। বেশিরভাগ চা নাকি বিদেশে চলে যায়। তখন বুঝলাম, আপনি ব্যবসাটা করতে জানেন। ব্যবসা বিমুখ হিসেবে বাঙালির একটা দুর্নাম আছে। বুঝলাম, আপনি একটু ব্যতিক্রমী। পরে এক ড্রাইভারের মুখে শুনলাম, গোটা দার্জিলিংয়ে একসময় অধিকাংশ বাগানই ছিল বাঙালিদের। এখন সব হাত বদল হয়ে গেছে। কেউ মারোয়াড়ি-গুজরাটিদের বিক্রি করে দিয়েছেন। আবার কেউ বা কোম্পানির হাতে বাগান তুলে দিয়েছেন। গোটা পাহাড়ে বাঙালি মালিক বলতে একমাত্র আপনি। এসব যখন জানতে শুরু করেছি, তখন কাশিয়াং ছেড়ে কালিম্পংয়ের দিকে রওনা দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার গেলাম। অথচ,

সেবার আমাদের পর্যটন মানচিত্রে কোথাও কাশিয়াং বা মকাইবাড়ি থাকার কথাই নয়। গিয়েছিলাম সিকিম। ফেরার পথে কেন জানি না মনে হল, একবার মকাইবাড়ি হয়ে গেলে কেমন হয়! চলে গেলাম। গিয়েই পড়লাম বিপদে। শুনলাম, বিমল গুরুংরা লাগাতার অবরোধ ডেকে বসে আছেন। পরের দিনেই ট্রেনে টিকিট কাটা আছে। যেভাবেই হোক, নামতেই হবে। সর্বনাশ, নামব কী করে! প্রেস স্টিকার লাগিয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত নেমে আসব, তারও উপায় নেই। কোনও ড্রাইভার রাজি নয়। কী করা যায়! কীভাবে যে তিনটে মোটরবাইক জোগাড় হয়েছিল, সে এক রূপকথার মতোই। তিনজনের পিঠেই ভারি ব্যাগ। পাঞ্জাবাড়ির ওই খাড়া রাস্তা দিয়ে প্রাণ হাতে করে নেমেছিলাম। নিচের দিকে তাকাছিলাম, আর ভয়ে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। বাকি দুই চালক ছিল নেপালি। কিন্তু আমি বসেছিলাম সঞ্জয়ের বাইকে। এই রে, নামটা ফাঁস করে দিলাম! একদিক দিয়ে ভালই হল। এত রহস্য রেখে লাভ কী! ফ্যাক্টরির দায়িত্বে

থাকা, আপনার প্রিয়পাত্র সঞ্জয় যে আমারও বড় প্রিয় পাত্র। আমার থেকে এক ক্লাস জুনিয়র। কিন্তু, আমাদের শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দামাল দিনগুলো যে একসঙ্গেই কেটেছে। স্কুল, টিউশানি কেটে ভরদুপুরে ক্রিকেটই হোক, লুকিয়ে সিনেমায় যাওয়াই হোক, আর সাঁওতাল পাড়ায় আম বা কুল পাড়তে যাওয়াই হোক, এমন অনেক দস্যিপনাই একসঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি। এমন কত দুপুর গড়িয়েছে বিকেলে, কত রাত খুঁজে নিয়েছে ভোরের ঠিকানা। নাচ থেকে জিমনাস্টিক্স, ক্রিকেট থেকে পড়াশোনা, সব ব্যাপারেই ছিল তুখোড়। যা চাইত, তাই হতে পারত। কখনও মনে হত বড় ক্রিকেটার হবে, পরক্ষণেই মনে হত, ভাল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে, নিদেনপক্ষে বড় আমলা হবে। কিন্তু ও যে এভাবে চায়ের দুনিয়ায় ঢুকে পড়বে, তা ভাবতেও পারিনি। ও নিজেও ভাবেনি। গ্র্যাজুয়েশনের পর হঠাৎ করেই ভর্তি হয়ে গেল প্ল্যান্টেশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। জড়িয়ে গেল চায়ের দুনিয়ায়। ভালবেসে ফেলল মকাইবাড়িকে। বিশ্বাস

করুন, ওকে ঘিরে কোনও আশ্বেপ নেই। বরং, বেশ গর্বই হয়। এশিয়ার সেরা চা আমার বন্ধুর হাতে তৈরি, এটা ভাবতে গর্ব হবে না! এখন মনে হয়, ভাগ্যিস ও এই দুনিয়ায় এসেছিল। নইলে তো, মকাইবাড়িকে, আপনাকে চেনাই হত না।

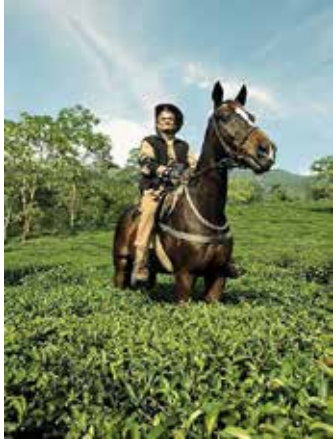
তাহলে, প্রথমবার আপনাকে চেনার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছিল কেন? আসলে, সেবার ছিল পাতা তোলার সময়। ফলে, ওকে সকাল থেকে রাত, প্রায় সবসময়ই ফ্যাক্টরিতেই কাটাতে হয়েছিল। চাইনি ওকে বিব্রত করতে। আমরা ঘুরেছিলাম আমাদের মতো করেই। তাই, অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। তারপর অফিসের কাজের সূত্রে চলে গেলাম উত্তরবঙ্গে। ছিলাম চোদ্দ মাস। আরও বেশি করে জড়িয়ে গেলাম আপনার বাগানের সঙ্গে। শিলিগুড়ি থেকে মকাইবাড়ি কতই বা দূর! মন খারাপ লাগলেই চলে যেতাম। কখনও সকালে বেরিয়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। দুপুরে নেমে এসে অফিস করলাম। কখনও

শীতের রাতে জমজমাট আড্ডা। একা একাই ঘুরেছি আপনার বাগানে। অনেকটা নিজের বাড়ি বলেই মনে হত। আপনার কাছেই তো সেই ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি। সেখানে গণ অভ্যুত্থানের সময় একটা স্লোগান উঠেছিল, ‘তোমার নাম, আমার নাম/ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।’ তখন আমার জন্মও হয়নি। কিন্তু স্লোগানটার কথা কতবার যে শুনেছি! ওই ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করত, ‘তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি/মকাইবাড়ি মকাইবাড়ি।’

থাক এসব কথা। একটু চায়ের কথায় আসি। এত বড় বাগান। তাহলে জঙ্গলটা কত বড়! আপনার বাগানের সত্তরভাগ জুড়ে নাকি শুধু জঙ্গল। এমনিতেই পাহাড় ঢেকে থাকে মেঘ আর কুয়াশায়। তার পর যদি ওই পাহাড়ে আরও গহন অরণ্যে ঢুকে পড়ি! সেই পাইনের বনে সূর্যের আলোও ঢোকান ছাড়পত্র পায় না। যেখানে সকালে ঢুকলেও গাইতে ইচ্ছে করে, ‘এ কোন সকাল/রাতের চেয়েও অন্ধকার।’ সেই জঙ্গলে

শুনেছি তিনখানা বাঘ আছে! ভয়েই গভীরে ঢুকতে পারিনি। অথচ, আপনি কী অবলীলায় সেই জঙ্গলে একা একা মাটিতে শুয়ে থাকতে পারেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ঘরে সেই নির্জনে শুধু পাখির ডাক শুনে কাটিয়ে দিতে পারেন! প্রতিটি গাছের জন্মবৃত্তান্ত নাকি আপনার মুখস্থ। মাঝে মাঝে ভাবি, আপনার জায়গায় অন্য কোনও মালিক থাকলে কী করতেন! গাছপালা সাবাড় করে সেই সম্ভবভাগ জায়গায় চা গাছ লাগিয়ে দিতেন। বছরে কয়েক হাজার কোটির বাড়তি মুনাফা কে ছাড়ত! অথচ আপনি! একটি গাছও কখনও কাটতে দেননি। শুধু জঙ্গল দেখভালের জন্য নিজের টাকায় এগারোজন ফরেস্ট রেঞ্জার রেখেছেন। গোটা কাশিয়াং সাব ডিভিশনে সরকারেরও তো এতজন রেঞ্জার নেই। আপনি মানুষটা সত্যিই বড় অদ্ভুত। এত বিত্তশালী হয়েও অরণ্যকে, প্রকৃতিকে এভাবে ভালবাসা যায়! আপনার চেয়ে বড় অরণ্যপ্রেমী আমি অন্তত কাউকে দেখিনি। বিভূতিভূষণ আপনাকে দেখলে হয়ত অরণ্যকের নতুন কোনও খন্ড লিখে ফেলতেন। অরণ্য নিয়ে বুদ্ধদেব

গুহর উপন্যাস
বোধ হয় একশো
ছাপিয়ে গেছে।
কেউ কি তাঁকে
আপনার কথা
বলেনি! তিনিই
জানেন। আমি শুধু
জানি, আপনার
ওই গাছগাছালি
পাহাড়ের বুকে
মেঘ আনে, বৃষ্টি



আনে। চা বাগানের ওপর দিয়ে যখন মেঘ ভেসে
বেড়ায়, তখন হৃদয়ে ঝড় তোলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
‘বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/এখানে মেঘ গাভীর
মতো চরে।’

জঙ্গল থেকে একটু চায়ে ফিরি! সেই উৎকর্ষকে বুঝাব,
এমন গভীরতা নেই। যতবার গেছি, সঞ্জয়ের সৌজন্যে

প্রতিবারই আপনার বাগানের গ্রিন টি খেয়েছি। বাজারে তার দাম নাকি কুড়ি হাজার টাকা কেজি। চমৎকার একটা রঙ, চমৎকার একটা গন্ধ। কাপের ওপর দিয়ে আলতো উড়ে যাওয়া মোলায়েম সেই ধোঁয়া! আহা! কবিতার জন্ম দিয়ে যায়। তখনই তো গাওয়া যায়, এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই। কিন্তু কেন এই চা এত মহার্ঘ্য, কেন সারা বিশ্বে সমাদৃত, তা বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি নেই। জ্যোতিবাবুর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। উনি প্রায়ই বলতেন, ‘হাজার টাকার চায়ের সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার চায়ের কী তফাত, আমি বুঝতে পারি না। আমার তো সব একইরকম লাগে। মনে হয় চাগুলো একই, শুধু প্যাকেটগুলো আলাদা।’ আমার অবস্থাও অনেকটা জ্যোতিবাবুর মতোই। তফাত বুঝতে পারি না। আমি নাই বা বুঝলাম। সারা বিশ্ব বুঝেছে, কুর্গিশ জানিয়েছে মকাইবাড়িকে। তাদের অনুসারি হয়ে আমিও না হয় শ্রদ্ধায় নতজানু হলাম।

বাগানের পরতে পরতে যে যত্নের ছাপ, যে গভীর

ভালবাসা লুকিয়ে আছে, তা তো অনুভব করেছি।
এমন সাজানো বাগান আর কটা আছে! যখন বর্ষা
আছে, গাছগুলো যখন বৃষ্টিতে স্নান করে, চরাচরজুড়ে
শুধু সবুজের সমারোহ। কতবার ইচ্ছে হয়েছে
আপনার মতো গাছের ওপর শুয়ে একটা ছবি তুলি।
পরে মনে হয়েছে, ওটা আপনাকেই মানায়। তাই,
একটি পাতাও কখনও ছিঁড়িনি। বাজারি সার নয়, প্রায়
তিন দশক আগে থেকে আপনি হেটেছেন জৈব সারের
পথে। ঘরে ঘরে কিনে দিয়েছেন অন্তত দেড় হাজার
গরু। পরিচর্যার টাকাও দিয়েছেন। দুধ সেই শ্রমিকের,
গোবরটুকু শুধু আপনার। সারা বিশ্বে যখন অর্গানিক-
এর ধুম পড়েছে, আপনি সেই পথ দেখিয়েছেন তিন
দশক আগে!

‘টুং, সোনাদা, ঘুম পেরিয়ে/ আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে/
যখন তখন পৌঁছে যাওয়া যায়’ স্বপ্নের দার্জিলিংয়ে।
যাওয়ার পথে কত চায়ের বাগান! কিন্তু অধিকাংশ
বাগানেই চোখে পড়ে ধস। আপনার বাগান! সত্যিই

ব্যতিক্রম। কোথাও এক ইঞ্চিও ধস নেই। এই তো সেদিন, ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কার্শিয়াং। চারিদিকে কত ধস নামল। কই, আপনার বাগানে তো আঁচড়ও কাটতে পারল না!

আপনি নাকি ঘোড়ায় চড়ে বাগান ঘুরতেন। সে দৃশ্য কখনও দেখিনি। তবে অনেকের মুখে শুনেছি। ছবিও দেখেছি। মনে মনে সেই দৃশ্যটা কতবার ভেবেছি! পায়ে হেঁটে কীভাবে ওই চড়াই উতরাই বাগানে ঘোরেন, তাও তো দেখেছি। এই ছেষটি বছরেও কী নির্মেদ আপনার চেহারা! শ্রমিকদের কাছে একটা মজার গল্প শুনেছি। আপনি নাকি ভুঁড়ি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। কারও একটু ভুঁড়ি থাকলেই রেগে যান। আপনার ধারণা, ভুঁড়ি মানেই সে অলস। আর তাই ভুঁড়িওয়ালা লোক পেলেই তাঁকে পাহাড়ের অনেকটা নিচে নামিয়ে নিয়ে যান। তারপর আপনার সঙ্গে সে বেচারাকে হেঁটে উঠতে হয়। সে হাসফাস করে, আর আপনি তাকে প্রশ্ন করেন, ‘বয়স কত হল?

এই বয়সেই এমন হাঁপিয়ে যাচ্ছেন!’ তারপর মাঝে মাঝেই আঁড়চোখে তাকিয়ে সেই হাঁপিয়ে যাওয়া দিব্যি উপভোগ করেন। একটা গোপন কথা তাহলে বলে রাখি। আমার মধ্যপ্রদেশটাও গত কয়েকবছরে একটু একটু করে প্রসারিত হয়েছে। পাহাড় ভালবাসলেও খাড়া পথে খুব বেশি উঠতে হলে হাঁপিয়ে যাই। বিশ্বাস করুন, একদিন স্বপ্ন দেখলাম, অনেক নিচের ওই থাপাথালি গ্রাম থেকে আপনি দিব্যি হেঁটে উঠে যাচ্ছেন মকাইবাড়ির দিকে। আর আমি মাঝপথেই হাসফাস করছি। তাই কি আপনার মুখোমুখি হতে পারিনি! এটাও কিন্তু একটা কারণ হতে পারে।

মালিক মানেই ঠান্ডা ঘরে বসে থাকা একটা লোক। যে লোকটা শুধু হুকুম করে যায়। আপনি সেই প্রচলিত ধারনাও ভেঙে দিলেন। সাত সকালে উঠেই বাগান ঘুরতে বেরিয়ে পড়া। ফিরতে ফিরতে সেই দুপুর দুটো-তিনটে। এমন মালিক, যিনি শ্রমিকের চেয়ে দ্রুত পাতা তুলতে পারেন। এমন মালিক, যিনি



মেশিন খারাপ হলে ইঞ্জিনয়ারের চেয়ে দ্রুত সারতে পারেন। এমন মালিক, যিনি তথাকথিত টি টেস্টারদের থেকে ভাল স্বাদ বোঝেন। এমন মালিক, যিনি ফরেস্ট রেঞ্জারের থেকেও ভাল গাছ ও পাখির ডাক চেনেন। মালিক মানে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ লোক, যে লোকটা সবকিছু করতে পারে। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, বাগানে শ্রমিকেরও অংশীদারিত্ব থাকুক। মুখের কথা নয়, নিজের বাগানে সেটা করে দেখিয়েছেন। শ্রমিকদের

নিয়েই তৈরি আপনার পরিচালন পৰ্যদ। তাও প্রায় দু দশক আগে। পাহাড়ে আপনি ছাড়া কোনও মালিক এই পথে হেঁটেছেন! আমার অন্তত জানা নেই। উন্নত লেখাপড়ার ব্যবস্থা তো আছেই। আছে চিকিৎসালয়। কোনও শ্রমিক অসুস্থ হলে শিলিগুড়ির প্রথমসারির নার্সিংহোমে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা। চিকিৎসা যত ব্যয়বহুলই হোক, এমন সহমর্মী মালিককে তাঁরা নাকি সব সময় সঙ্গে পান। বেকার যুবকদের ট্রাঙ্কি কেনার জন্য লোন দেওয়া! এমনটাও কখনও শুনিনি।

এবার আসি হোম ট্যুরিজমে। আমার না হয় সঞ্জয় আছে, সকলের তো এমন বন্ধু থাকে না! তাহলে, তারা মকাইবাড়ি আসতে পারবে না! দ্বিতীয়বারেই সঞ্জয়কে বলেছিলাম, এই বাগানের প্রেমে পড়ে গেছি। তুই যখন থাকবি না, তখন কী করব? তখনই জেনেছিলাম আপনার হোম ট্যুরিজমের কথা। হ্যাঁ, এ ব্যাপারেও আপনিই সম্ভবত পথিকৃত। নিজের খরচে বানিয়ে দিয়েছেন বেশ কিছু অত্যাধুনিক কটেজ।

সেখানে সোফা থেকে কমোড, অত্যাধুনিক সব ব্যবস্থাই আছে। একেবারে বাড়িতে থাকার মতোই। সেই বাড়িগুলো তুলে দিয়েছেন শ্রমিকদের পরিবারের হাতে। তারাই রান্না করে পর্যটকদের খাওয়ায়। ইচ্ছে হলে, পর্যটক নিজেও রান্না করে খেতে পারেন। এই সুযোগে নেপালি দিদি বা মাসির কাছে মো মো বানানো শিখেও নিতে পারেন। খরচও বেশি নয়। থাকা খাওয়া মিলে দুজনের খরচ বারোশো টাকার মতো। যে এসব দেখভাল করে, সেই নয়ন লামার সঙ্গেও বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ওর ফোন নম্বরও (৯৮৩২৪ ৪৭৭৭৪) নিজের মোবাইলে সেভ করে নিয়েছি। সঞ্জয়ের নম্বর অবশ্য কাউকে দিইনি। এত ভাল পাত্র। মেয়ের বাবারা যদি হামলে পড়ে! বেচারার বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না। তবে চুপি চুপি বলে রাখি, আপনি ওর জন্য একটা ভাল মেয়ে দেখতে পারেন। ছেলেটা নেপালি ভাষাটা চমৎকার বলে। তাই নেপালি মেয়ে হলেও আপত্তি নেই। ওর বাবাকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ। বছরের একটা বিরাট সময় কাটে বিদেশে। কখনও চা নিয়ে বলতে ছুটে যান অক্সফোর্ডে, কখনও কেমব্রিজে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরোয় আপনার জীবনী। কখনও আপনাকে নিয়ে তথ্যচিত্র করতে মকাইবাড়িতে ছুটে আসে বি বি সি। আবার কখনও টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদজুড়ে আপনি আর মকাইবাড়ি। এতকিছুর পরেও এই পোড়া দেশ থেকে কতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছেন! একটা পদ্মশ্রী! না, তাও দিতে পারেনি এই ভারতবর্ষ। অথচ, প্রায় কেউ জানে না, আট বছর আগে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল আপনার নাম। আমরা সত্যিই কুপমন্ডুক, কতটুকুই বা খোঁজ রাখি! অথচ, যদি নোবেল পেয়ে যেতেন, দেখতেন মাতামাতি কাকে বলে! তখন কে আপনার কত কাছের, তা জাহির করার হিড়িক লেগে যেত। টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে আপনি, অথচ কোনও বাংলা কাগজ বা ম্যাগাজিনে আপনার ছবি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। রাজ্যের কোনও স্বীকৃতি!

নিদেনপক্ষে বঙ্গভূষণ! না, তাও না। ওঁদের আর দোষ
কী! আপনার কথা ওঁরা জানলে তো! একদিক থেকে
ভালই হয়েছে। যাঁরা এসব পুরস্কার টুরস্কার পান,
তাঁদের অনেকেরই যোগ্যতা নেই আপনার পাশে
দাঁড়ানোর। তাছাড়া, সেই দাক্ষিণ্যভোগীদের সঙ্গে
আপনাকে মানাতোও না। আপনি একা আছেন, বেশ
আছেন। এভাবেই বনস্পতির মতো মাথা উঁচু করে
দাঁড়িয়ে থাকুন।

জানেন, মাঝে মাঝে খুব ভয় হয়। শুনেছি, আপনার
দুই ছেলের একজন থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়, অন্যজন
বেঙ্গালুরুতে। বাগান সম্পর্কে তাঁদের সেই মমত্ববোধ
আছে তো! আপনার অবর্তমানে এই বাগান হাতবদল
হয়ে ‘বেওসায়ী’দের হাতে চলে যাবে না তো! সেদিন
কী হবে এই অরণ্যের? কী হবে এই বাগানের? সেদিন
কীসের টানে ছুটে যাব আমার মকাইবাড়িতে? সেদিন
কি গর্ব করে বলতে পারব, তোমার বাড়ি আমার
বাড়ি/মকাইবাড়ি মকাইবাড়ি!

পাইন বনের মেঘমাখানো চিঠি

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি। বলাই যায়, ব্যস্ত ছিলাম। ব্যস্ত দুনিয়ায় ব্যস্ততা এমন একটা অজুহাত, সহজেই লোকে বিশ্বাস করে নেয়। কারণ, আমি ছাড়া প্রায় সবাই ব্যস্ত। তাদের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে ফেলাই যায়। কিন্তু আমি নিজে তো জানি, আমি মোটেই তেমন ব্যস্ত নই। আমার হাতে অটেল সময়। তাহলে, এমন ডাঁহা মিথ্যেটা লিখি কী করে!

কলকাতায় বসে থাকলে তবু না হয় দু চারটে মিথ্যে লেখা যায়। কিন্তু পাহাড় মানুষকে উদার হতে শেখায়। প্রকৃতির এমন সান্নিধ্যে এসে মিথ্যে বলা উচিত নয়। জানলার ওপারে চোখ রাখলেই ঝলমল করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। না, কোনও ‘সাজানো ঘটনা’ বা ‘সাজানো

ছবি' নয়। ঘণ্টা দুই আগেও চারটে চূড়া দেখা যাচ্ছিল। এখন কিছুটা মেঘ এসে দুটো চূড়ো ঢেকে দিয়ে গেছে। তবে দুটো চূড়ো বেশ ভালই দেখাচ্ছে। সকালে ছিল দুধ সাদা রঙ। বেলা বাড়ার পর কেমন যেন নীলাভ চেহারা নিচ্ছে।

মেঘের কথা লিখছিলাম। জানো, জানালার ওপারে কী সুন্দর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে ঘরেও ঢুকে পড়েছে। শক্তি চাটুজ্জের কবিতা ধার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে।' তোমার তো আবার আবার কবিতায় অ্যালার্জি। বেশ, তাহলে গানের ভাষাতেই বলি। মান্না দে-র একটা গান এই সময় খুব মনে পড়ে যাচ্ছে – 'আমার ইচ্ছে করে শূন্যে উঠে মেঘের উপর দিয়ে হাঁটি।' আগে যখন গানটা শুনতাম, মনে হত গাঁজাখুরি। খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। 'মেঘের উপর দিয়ে হাঁটি'! কিন্তু এখন সত্যি সত্যি আমারও হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছে



করছে। মেঘের কি
আর ঠিকানা আছে!
কোথায় উড়ে যাবে,
কে জানে! তোমার
ঠিকানাও তো জানি
না। তবু চিঠি লিখতে
বাধা কোথায়!
যেমনভাবে লিখি,
পৌঁছয় না, তবু লিখি।

তুমি নিশ্চয় ভাবছ, সাত সকালে আমি কী সব ভুলভাল
বকছি। কলকাতায় বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাই কোথায়, আর
মেঘের উপর হেঁটে বেড়ানোই বা কোথায়! আসলে
আমি এখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে। জঙ্গলে
ঘেরা এক পাহাড়ের দেশে। না, আর হেঁয়ালি করে
লাভ নেই। কোথায় আছি, বলেই ফেলি। আমি এখন
লেপচা জগতে। এবার নিশ্চয় ভাবছো, লেপচা জগৎ

! সেটা আবার কোথায় ? যদি এই প্রশ্নটা তোমার মনে এসেও থাকে, তাও তোমাকে দোষারোপ করা যাবে না। কারণ, অনেকেই জানে না, এই লেপচা জগতের হৃদিশ। সমতলের কথা ছেড়ে দিলাম। এই পাহাড়েই বা কজন জানে! এমনকি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে বা শিলিগুড়ি জংশনে যারা সারি সারি গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদেরও অধিকাংশই জানে না। তারা সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, দার্জিলিং, দার্জিলিং, গ্যাংটক-গ্যাংটক।

আরে বাবা, এই দুটো জায়গা তো সবাই জানে। বাঙালিকেও বলিহারি। পিলপিল করে সব ছুটছে দার্জিলিং আর গ্যাংটকে। পারলে সেখানে সুরুচি সঙ্ঘ বা একডালিয়ার দুর্গাপূজো লাগিয়ে দেয়। ভিড় থেকে একুট নির্জনে কটা দিন কাটানোর জন্যই তো বেড়াতে আসা। সেখানে ওই গিজগিজ করা ভিড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয়! বহুকাল আগে সত্যজিৎ

রায় লিখেছিলেন, গ্যাংটকে গন্ডগোল। আর বাঙালির এই গ্যাংটক আদিখ্যেতা দেখে এখন বেঁচে থাকলে নিশ্চিতভাবেই লিখতেন, ‘গ্যাংটকে গন্ডমূর্খ।’ তিনি নেই তো কী হয়েছে, কোনদিন আমিই লিখে ফেলব। সিকিম শুনলেই লোকে বলে গ্যাংটক গিয়েছিলে? যেন সিকিমে আর কোনও জায়গা নেই। ফিরে আসার পথে ট্রেনে যখন সেই ফোনালাপ শুনি, তখনও মাথা গরম হয়ে যায়। ‘জানো তো, আমরা ছাঙ্গু গিয়েছিলাম। বরফ ছিল। অনেক ছবি তুলেছি। দেখবে, ফেসবুকে দেওয়া আছে।’ কে দেখতে চেয়েছে? এইসব বোকা বোকা ছবিতে ততোধিক বোকা বোকা সব কमेंটস পড়বে। নাইস পিকস, এটা কোথায়, কবে গেলি? এসব ন্যাকা ন্যাকা প্রশ্ন। কী আর করা যাবে! এই জাতীয় পাবলিকেরাই সংখ্যায় ভারি। এদের নিয়ে যেতেই যত হুড়োহুড়ি। এরা দার্জিলিং যায়। কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট, সেভেন পয়েন্ট নামক চক্করেই পড়ে যায়। পায়ে হেঁটে আসল দার্জিলিংটাকে চেনার

চেষ্টাই করল না। হাতে গোনা কয়েকজন পর্যটককে পাবে, যারা দার্জিলিংয়ের স্পন্দনটা অনুভব করতে পেরেছে। তাই যারা প্রকৃতি ভালবাসে না, যারা শপিং মল খোঁজে, হোটেলের টিভিতে স্টার জলসা বা জি বাংলা না এলে যাদের মুখ ব্যাজার হয়ে যায়, এমনকি ইস্টিকুটুম বা জলনুপুর না দেখলে পেট গুড়গুড় করে, এই লেপচা জগৎ তাদের জন্য নয়।

অঞ্জন দত্তর একটা গান মনে পড়ছে ? ‘টুং সোনাদা ঘুম পেরিয়ে, আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে, যখন তখন পৌঁছে যাওয়া যায়।’ গড়পড়তা বাঙালি এই একটা রাস্তার বাইরে আর অন্য রাস্তা খুঁজেও পেল না। কিন্তু দার্জিলিং যাওয়ার আরও একটা চমৎকার রাস্তা আছে, পর্যটকরা সেভাবে জানেই না। এই রাস্তাটা অবশ্য কাশিয়াং হয়ে নয়। তুমি নিশ্চয় মিরিক লেকের নাম শুনেছ। মিরিক লেক পেরিয়ে নেপাল বর্ডারে নেমে পড়তে পারো। গাড়ি দাঁড় করিয়ে দশ পনেরো মিনিটের জন্য ঢুকে



যাও ভিনদেশে। পাসপোর্ট, ভিসা কিছুই লাগবে না।
বিদেশের মাটিতে এক কাপ চা—মন্দ কী ? সেই
‘এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই’। সঙ্গে একটু
ওয়াই ওয়াই হয়ে যেতে পারে। ওয়াই ওয়াই? সেটা
আবার কী? ভয় নেই, এটা ম্যাগির পার্বত্য সংস্করণ।
এখন কলকাতাতেও পাওয়া যায়। ছোট বিজ্ঞাপন
বিরতির মতোই, ছোট বিদেশ বিরতির পর আবার
তুকে পড়তে পারো ভারতের ভূখণ্ডে। আরও কিছুদূর
গেলেই সুখিয়া পোখরি। এলাকাটা বেশ সমৃদ্ধ। বড়
বাজার, দোকান, হোটেল, গাড়ি, সবই আছে। সুখিয়া
পোখরি পেরিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে ঘুম স্টেশনের

দিকে। জিকে-র বইয়ে ঘুম স্টেশনের কথা নিশ্চয় পড়েছো। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু রেল স্টেশন। সেখান থেকে দার্জিলিং মাত্র আট কিলোমিটার। আমাদের এই লেপচা জগৎ অবশ্য ঘুমেরও আট কিলোমিটার আগে। বলতে পারো, সুখিয়া পোখরি আর ঘুমের ঠিক মাঝখানে। জায়গাটা দার্জিলিং থেকে অনেক উঁচুতে। ফলে, ঠান্ডাও বেশি, গাছপালা তো অনেক বেশি। নিঝুম পাইন বন, মাঝে মাঝে ওকের সারি, আর রডোডেনড্রন তো আছেই। পাহাড়ের ওপর কেমন একটা জঙ্গলের আবহ। বাংলার মধ্যে এমন একটা সুন্দর জায়গা আছে, আমরা জানতামই না! কাকে আর দোষারোপ করব!

কে যে এই লেপচাজগৎ নাম রেখেছিল, বলা মুশকিল। স্থানীয় লোকেরাও জানে না। তোমার সবজান্তা গুগল বা অন্য সার্চ ইঞ্জিনও সেভাবে জানে না। তবে ব্রিটিশরা জানত। ব্রিটিশরা আসারও অনেক

আগে থেকেই এখানে নাকি লেপচারা থাকত। তখন তো এমন সুন্দর রাস্তা ছিল না। যানবাহনও ছিল না। কীভাবে তারা উঠত, কীভাবে জীবনধারণের উপাদান সংগ্রহ করত, সেও এক বিস্ময়। একটু নেমে গেলেই ইংরেজ আমলের একটা বাড়ি আছে। সেটাকেই গেস্ট হাউস বানিয়েছে আমাদের ফরেস্ট ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন। খুব যে ভাড়া, তাও নয়। ফোর বেডেড ডরমেটোরিও আছে। খাওয়া নিয়ে টেনশন নেই। ক্যান্টিনে একটু আগে থাকতে বলে রাখলেই হল। একটু উপরে উঠলে, রাস্তার উপর দু একটা ছোটখাটো দোকানও পাওয়া যাবে, সেখানেও খাওয়া যায়। সেই দোকানে একটু আগে থেকে বলে রাখলে ভাল হয়। মোমো, থুকপা, চাউমিন থেকে ওয়াই ওয়াই, সবই পাওয়া যায়। তোমার অবশ্য ডাল ভাতের ব্যামো নেই। দু একদিনের তো ব্যাপার। একটু না হয় পাহাড়ি খাবার খেলে। অবশ্য ডাল, ভাত, মাছও চাইলেই পাওয়া যায়। একটু আগে থেকে বলতে হবে, এই যা।

সমতলের গাড়িওয়ালারা চিনুক আর না চিনুক, ব্যতিক্রমী পর্যটকরা ঠিক জানে। ভাগ্যিস, ট্যুরিজমের অফিস থেকে বুকিং করে এসেছিলাম। নইলে, এখানে এসে তো জায়গাই পেতাম না। এমন নির্জন পাহাড়ে এমন সুন্দর একটা আস্তানা আছে, তা তো জানতামই না। আর এসব জায়গার প্রচারও হয় না (মাঝে মাঝে মনে হয়, বেশি প্রচার না হওয়াই ভাল। যত উটকো লোকের ভিড় বাড়বে)। দিন দিন ট্যুরিস্ট তো আরও বাড়বে। তখন কী হবে? রাস্তার ধারে একটা হোম ট্যুরিজম চালু হয়েছে। সেটাও মন্দ নয়। কী ভাবছ, এমন সুন্দর জায়গাটার কথা আগে বলিনি কেন? নিজেই তো জানতাম না। দু একজনের মুখে শুনেছিলাম ঠিকই, এমন অনেক জায়গার কথাই তো শুনি। আর নেটের ছবি দেখে সব জায়গাই সুন্দর মনে হয়। এভাবে কতবার যে ঠকেছি! ছবি দেখে চলে গেছি। গিয়ে বুঝেছি, ছবির সঙ্গে বাস্তবের অনেক ফারাক। তাই এখানে আসার আগেও একটা

‘কিন্তু কিন্তু’ ব্যাপার ছিল। কিন্তু যেই সুখিয়া পোখরি পেরোলাম, যেই গাড়ির জানালা দিয়ে মেঘ ঢুকে আসছে, তখনই মনে হল, ঠিক জায়গাতেই এসেছি।

আমার বাকি সঙ্গীদের ওপর খুব রাগ হচ্ছে। বেলা সাড়ে আটটা বাজে। এখনও ব্যাটারা ঘুমোচ্ছে। আরে বাবা, বাড়িতে যত খুশি ঘুমো, কেউ তো বারণ করেনি। বেড়াতে এসে কেউ এভাবে ঘুমোয়! সব ব্যাটা বেরসিক। বাড়িতে তো আমারও ওঠার কোনও ঠিক থাকে না। তাই বলে বাইরে এসে যদি ভোর না দেখলাম, তাহলে তো অর্ধেক আকর্ষণ সেখানেই ফুরিয়ে গেল।

আমি ভোর পাঁচটায় উঠে পড়েছিলাম। জানি, ডাকলেও কেউ উঠবে না। সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়। অতএব, একলা চলো রে। ওই তো দূরে, মানেভঞ্জন। টোংলু হয়ে খাড়া রাস্তাটা উঠে গেছে



সান্দাকফুর দিকে। বরফে ঢাকা বাংলার সবথেকে
উঁচু ভূখণ্ড। ওখানে অনেকে নাকি ট্রেক করে যায়।
মধ্যপ্রদেশ যে হারে স্ফীত হচ্ছে, এখন সেই ট্রেক
করার কথা ভাবাও যেন দুঃসাহস। ভোরের আলো
ফুটছে, একটু একটু করে জেগে উঠছে পাহাড়ি
গ্রামগুলো। পাহাড়ে এলে আমার বড্ড দিক গুলিয়ে
যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘাটা কোনদিকে পড়বে, বুঝতে
পারছিলাম না। কাউকে জিজ্ঞেস করব, তারও
উপায় নেই। এত ভোরে রাস্তা শুনশান। একজনকে
পেলাম। সে বলল, এদিকে জঙ্গলে ঢাকা পড়ে

যাবে। ওই রাস্তার মোড় থেকে দেখতে পাবেন।
সে কী অপরূপ দৃশ্য, তোমাকে লিখে বোঝাতে
পারব না। মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তোলার ব্যর্থ
চেষ্টা করলাম। ক্যামেরার সাধ্য কী, ওই মুহূর্তকে
ধরে রাখে!

আমার কুম্ভকর্ণ সঙ্গীদের কথা ভাবছিলাম।
ব্যাটাদের উপর তখন আর রাগ নয়, করুণাই
হচ্ছিল। ওরা জানল না, ওরা কী হারাল। আচ্ছা,
তোমারও তো আগে দেরীতে ওঠা অভ্যেস ছিল।
এখনও বুঝি তাই আছে! তুমি এলে কী করতে ?
তুমিও কি ওদের মতোই মটকা মেরে বেলা পর্যন্ত
ঘুমোতে ? নাকি ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়তে ? না
উঠলে কানের সামনে চিৎকার করতাম। বা, ‘ক্ষমা
করো রবি ঠাকুর’ বলে, চিৎকার করে রবীন্দ্র সঙ্গীত
গাইতে শুরু করে দিতাম।

আচ্ছা, বেসুরো গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে কারুর
ঘুম ভাঙানোটা কি শ্লীলতাহানির পর্যায়ে পড়ে ?
পড়লে পড়ুক। ভোর হওয়ার মুখে তোমার হাত ধরে
বেরিয়ে পড়ব। ওই পাইন বনে হারিয়ে যাব।

মেঘ পাহাড়ের দেশে হারিয়ে যাওয়ার দিনলিপি

৩১ জুলাই, রাত ১১ টা

সে ভারী অদ্ভুত লোক। যা জিজ্ঞেস করি, সবেতেই ‘হাঁ সাব’। এমনকি পরস্পরবিরোধী দুই প্রশ্ন হলেও দুবারই শুনতে হবে, ‘হাঁ সাব’। হিসেবের কথা উঠলে, একটা কথাই যেন মুখস্থ- ওয়ান ফিফটি।

নিশ্চয় ভাবছিস, লোকটা কে? এই গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার। নাম লকপত। গেস্ট হাউস থেকে অনেক নীচে একটা গ্রামে ওর বাড়ি। গ্রামের নামটা বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করলাম। কী যে বলছে, বোঝাই মুশকিল। ওর অদ্ভুত উচ্চারণে একেকবার একেক রকম শোনালো। আর বোঝার চেষ্টা না করে,

এটুকুই বুঝলাম, গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা নীচে নেমে গেছে, সেই রাস্তা ধরে কিছুদূর নেমে গেলে ওর গ্রাম। এটুকু জানাই ভাল। মনে পড়ে গেল ‘হীরক রাজার দেশে’র সেই সংলাপটা, ‘জানার কোনও শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই।’ এত জেনে কাজ নেই বাপু। থাকব তো দুদিন। তবে সামনের দুদিন এই লকপতই আমাদের ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড।

শুরুই করলাম লকপতকে দিয়ে। লকপত যে গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার, এটাও বলে ফেলেছি। কিন্তু হঠাৎ গেস্ট হাউস কেন, কোথায়ই বা এলাম, এ নিয়ে কৌতূহল হতেই পারে। আগে থেকে বলে রাখলে হয়ত কৌতূহল হত না। তখন পৌঁছনো সংবাদটুকু জানিয়ে দিলেই হত। বা ইদানীং তো লোকে যা যা করে, ফেসবুক আপডেট দিয়ে দেয়। আমি এখন চা খাচ্ছি, আমি এখন অফিসে ঢুকলাম। ঢুকলি বেশ



করলি। দুনিয়ার লোককে ঢাক পিটিয়ে জানানোর কী আছে বাপু? শুধু কি তাই, পেট খারাপ হলেও দেশ দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে জানায়। কী আশ্চর্য! তাতে অসংখ্য বোকা বোকা কমেন্ট আর লাইকও পড়ে যায়। তারা যে বাইরে বেড়াতে এলে কী করত, কে জানে! প্রতিটি বাঁকে এসে ছবি তুলত। আর দেশশুদ্ধ লোককে জানিয়ে দিত। ভাগ্যিস, আমরা যে চারজন এসেছি, তাদের মধ্যে কেউ ফেসবুক আসক্ত নই। বাকি তিনজনের অ্যাকাউন্ট থাকলেও তাদের মধ্যে যে খুব একটা আসক্তি নেই, তা এই একদিনেই বেশ

বুঝেছি। অন্তত এই একদিনে অস্বাভাবিক কোনও ছোঁকছোঁকানি দেখিনি। আর এই অধমের নামে তো কোনও অ্যাকাউন্টই নেই। একটা অ্যাকাউন্টে মাঝে মাঝে ঢুকি, সেও আমার নিজস্ব নয়। তার পাসওয়ার্ড অন্তত জনা দশেক লোক জানে। থাক ওসব কথা। এই মেঘের দেশে এসে ওসব কথা টেনে না আনাই ভাল।

আবার এসেছি পাহাড়ে। এই পাহাড়ে তোর সঙ্গে কোনও স্মৃতি নেই। তবু কেন জানি না, পাহাড় এলেই তোর কথা বড় বেশি করে মনে পড়ে যায়। একটার পর একটা মেঘ উড়ে আসে। মন কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির নানা গান আপনাআপনিই গলায় এসে যায়। জগজিৎ সিং থেকে মান্না দে, হেমন্ত থেকে শ্রীকান্ত- সবাই এসে পড়ে। আর আমাদের অস্তিত্ব ও অভ্যাসের অঙ্গ রবি ঠাকুর তো আছেনই। কবিতায় কখনও শক্তি চাটুজে

তো কখনও জয় গোঁসাই। সেই গান বা কবিতায়
প্রেম আছে, বিরহ আছে, নিসঙ্গতা আছে। লুকোনো
অভিমান! তাও বেশ আছে।

আমি একটা যাচ্ছেতাই। একদিকে বৃষ্টি, কবিতা,
গানের কথা বলছি। আর বেরসিকের মতো একথা
থেকে সে কথায় হারিয়ে যাচ্ছি। কোথায় এসেছি,
সেটাই তো এখনও বলিনি। জায়গাটার নাম বাগোড়া।
নিশ্চয় শুনিসনি। না, এর জন্য তোর হীনম্র্যাতায়
ভোগার কিছু নেই। শতকার নিরানব্বই ভাগ বাঙালিই
জানে না। এমনকী যারা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়,
তারাও জানে কিনা সন্দেহ। এটা কাশিয়াং ফরেস্ট
রেঞ্জের মধ্যেই পড়ছে। কাশিয়াং পর্যন্ত কীভাবে
আসতে হয়, নিশ্চয় বলতে হবে না। দুটো রাস্তা, একটু
জেনে রাখ (যদি কখনও আসিস)। কাশিয়াং থেকে
যে রাস্তাটা দার্জিলিংয়ের দিকে যাচ্ছে, সেই রাস্তা
ধরে আরও মিনিট কুড়ি যেতে পারিস। টুং পেরিয়ে

দিলারাম বলে একটা জায়গা পড়বে। সেখান থেকে ডানদিকে একটা রাস্তা উঠে গেছে। এয়ারফোর্স স্টেশনের দিকে। বেশ খাড়া পথ। প্রায় চার কিমি। খাড়া পথে চার কিমি মানে অনেকটা। এটাই বাগোড়া পৌঁছানোর সহজতম রাস্তা। নইলে কার্শিয়াং থেকে ডাউহিল দিকে যাওয়ার যে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে চিমনি পেরিয়ে বাগোড়া পেয়ে যাবি।

চারিদিকে পাইন গাছের ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর সূর্যের আলোও ঢোকে না। দিনের বেলাতেও একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব। সেই সঙ্গে মেঘের ভেসে বেড়ানো তো আছেই। সব মিলিয়ে জায়গাটায় এলে মন ভরে যাবে। হয়ত ভাবছিস, থাকব কোথায়? চুপি চুপি জানিয়ে রাখি, আমরা আছি ফরেস্টের গেস্ট হাউসে। বুকিংয়ের একটু ঝামেলা আছে। অনেক আগে থেকে কার্শিয়াং ডি এফ ও-কে জানিয়ে রাখতে হবে। তিনি কনফার্ম করলে তবেই

বুকিং। ফাঁকা থাকলেই যে পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। মাত্র দুটি ঘর। বুঝতেই পারছি। কখন কোন ভিআইপি এসে পড়বেন, সেই ভেবে খালি রাখতে হয়। এগুলোয় পর্যটকরা থাকুক, বন দপ্তর এমনটা চায় বলে মনে হয় না। আমরা পেয়েছি আমাদের সঙ্গে এক আধিকারিক বন্ধুর জন্য। সে ব্যাটা কয়েকদিন ধরে মেল পাঠিয়ে, ফোন করে, ডিএফও-র পেছনে মার্কারের মতো লেগেছিল। তাই হয়ত না দিয়ে পারেনি। তবে এই বাংলোর ভরসায় এলে একটু মুশকিলই আছে। তাই এসেই একটা হোম স্টে-র সন্ধান করে নিয়েছি। ডিকি হাউস। বাগোড়া বাজার থেকে একটু এগোলেই এই হোম স্টে। জনা পনেরো থাকতেই পারে। একটু আগে থেকে ফোন করে এলে সমস্যা নেই। আজ আপাতত এটুকুই থাক। বাকিরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সময় পেলে কাল আবার লিখব।

১ আগস্ট, সকাল দশটা

কাল হঠাৎ করে থেমে গিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছি, বাইরে এলে তো অথগু অবসর থাকে না। দল বেঁধে এলে তো আরও থাকে না। অন্যদের কথা মাথায় রাখতে হয়। সেই অনুযায়ী টাইম অ্যাডজাস্ট করতে হয়। যেমন, আজ উঠেছিলাম বেশ ভোরেই। এক রাউন্ড হাঁটা হয়ে গেল। সে কথায় পরে আসছি। কেন এই বাগোড়ায় এলাম, এই সুযোগে বরং সেটা একটু বলে নেওয়া যাক। কোথায় যাওয়া যায়, এই নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। যেহেতু আমি কর্মসূত্রে প্রায় বছর দেড়েক উত্তরবঙ্গে ছিলাম, তাই অনেকে ভাবে আমি বোধ হয় উত্তরবঙ্গ বিশারদ। আমি বোধ হয় পাহাড়ের অলিগলি চিনি। চিনি না বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ ভাবে বিনয় দেখাচ্ছি, কেউ ভাবে দায়িত্ব এড়াতে চাইছি। তাই আমাকেও চিনি এরকম একটা ভান করতে হয়। তবে এই বাগোড়া অবশ্য একেবারে



অজানা ছিল না। ঠিক এক বছর আগে একবার চিমনিতে দুদিন ছিলাম। সেদিনই এক ফাঁকে ঘুরে গিয়েছিলাম এই বাগোড়া থেকে। সেবার থাকা হয়নি। কিন্তু ইচ্ছে ছিল, একদিন না একদিন এই বাগোড়ায় ফিরে আসব। তাই বাকিরা যখন আমার উপরেই ছেড়ে দিল, তখন মনে হল, এই সুযোগে ওদের একটু বাগোড়ায় ঘুরিয়ে আনা যাক। খারাপ লাগবে না, এটুকু নিশ্চিত ছিলাম। যে তিনজন সঙ্গে ছিল, তাদের কথা

বরং বলা যাক। একজন সম্ভ্র। সরকারি আধিকারিক।
এর বেশি আপাতত বলছি না। দ্বিতীয় জন রূপম।
পেশায় শিক্ষক, কিন্তু নেশা ক্যামেরা। এই দুজন পূর্ব
পরিচিত। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের সহপাঠা
(পুং লিঙ্গ, তাই সহপাঠী বললাম না, সহপাঠা-টাই
ভাল, কী বলিস!)। আরেকজন দেবশিস। বাড়ি
পান্ডুয়ার কাছে, রূপমের স্কুলেই অঙ্কের শিক্ষক।
রূপম একাই বিবাহিত, বাকি আমরা তিনজনই
জীবিত। তবে বিবাহিত বলে রূপমকে গৃহপালিত
প্রাণী ভাবার কোনও কারণ নেই। ও বরং আমাদের
থেকেও বেশি বাউন্ডুলে। সারা বছর সুযোগ পেলেই
ক্যামেরা নিয়ে এখান ওখানে বেরিয়ে পড়ে।

তবে সব সময় ক্যামেরাধারীদের সঙ্গে গড়পড়তা
টুরিস্টদের একটা তফাত থাকে। আমরা যখন মেঘ
দেখে রোমান্টিক হয়ে উঠছি, ও তখন প্রকৃতিকে
গালমন্দ করছে। ও চায় রোদ। নইলে ছবি ওঠে

না। আজ সারাদিন রোদের দেখা নেই। শুধু বৃষ্টি।
বাংলোর কাঁচের জানালার এপার থেকে বৃষ্টি দেখতে
বেশ ভালই লাগছিল। জেনেশুনেই তো বর্ষাকালে
এসেছি। বৃষ্টি হবে, এই মানসিক প্রস্তুতি তো ছিলই।
তাছাড়া, আমাদের তো তথাকথিত ‘সাইট সিন’
দেখার কোনও পরিকল্পনাও ছিল না। জঙ্গল আর
পাহাড় ঘেরা এই বাগোড়ায় অলসভাবে দুটো দিন
কাটবে, এর থেকে বেশি চাওয়া তো কিছু ছিল না।
তাই কখনও বৃষ্টি পড়বে, কখনও থামবে। এতে
আশ্চর্যের কী আছে? বিরক্তিরই বা কী আছে ? কী
জানি, রূপম হয়ত মনে মনে খুব রেগে আছে। ব্যাটা
ক্যামেরা বের করে বসে আছে। সামনে এমন ঝাপসা,
কোনও ছবিই আসবে না। ছবি সম্পর্কে ওর একটা
প্যাশন আছে। ওর ছবির রীতিমতো এগজিভিশন হয়।
ফিল্ম ফেস্টিভালেও অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার। মাঝে
মাঝেই ছবি তোলার নানা গল্প উঠে আসছে। শুনতে
বেশ ভালই লাগছে। ছবি তোলার গল্প যত না বলছে,

স্কুলের কথা বা ছাত্রদের কথা সে তুলনায় অনেকটাই কম। বোঝা গেল, মাস্টারিটা ওর চাকরি। কিন্তু প্রথম প্রেম ওই ছবিটাই। থ্রি ইডিয়টস দেখেছিস? সেই ফারহানের কথা মনে পড়ে গেল। সে ইঞ্জিনায়ারিং ছেড়ে ওয়াশিংটন লাইফ ফটোগ্রাফার হয়েছিল। ইসস, রূপমও যদি এমন হতে পারত!

১ আগস্ট, সন্ধ্যা ৭ টা

ভোরে ঠিক মতো ঘোরা হয়নি। ব্রেকফাস্ট সেরে বেলার দিকে আবার বেরিয়েছিলাম। কিছুটা হেঁটে গেলে এয়ারফোর্স স্টেশন। ঘুরতে ঘুরতে কাছে পৌঁছে গেলাম। এই তল্লাটে এটাই সবথেকে উঁচু জায়গা। এখান থেকে পরিষ্কার সবকিছু দেখা যাচ্ছে। মনে হল, একবার এয়ারফোর্স স্টেশনে ঢুকলে কেমন হয়? ঢুকতে যে দেবে না, সেটা মোটামুটি জানাই ছিল।

তবু নিরীহ পর্যটক ভেবে যদি ছাড় দেয়! গেটে গিয়ে
সিকিউরিটিকে বললাম। সে দেখিয়ে দিল তার বসকে।
ভেতরে দিয়ে সিকিউরিটি অফিসারকে বললাম।
ওই যেভাবে বলে আর কী! বোঝা গেল, তিনিও
অ্যালাউ করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি আর তাঁর
ওপরওয়ালার কাছে পাঠালেন না। খুব সুন্দরভাবে
আমাদের ভাগিয়ে দিলেন। বললেন, ‘ভেতরে ঢুকে
কী দেখবেন? এই ছোট্ট একটা এয়ারফোর্স স্টেশন।
দেখার কিছুই নেই। ভেতরে ন্যাচারাল বিউটি বলে
কিছুই নেই। আমরা বোর হয়ে গেলে বাইরে থেকে
একটু ঘুরে আসি। আর আপনারা কিনা বাইরে থেকে
ভেতরে এলেন! বাইরেটা ভাল করে ঘুরে দেখুন।
জঙ্গলে হেঁটে আসুন, ভাল লাগবে।’

অগত্যা, আবার বেরিয়ে পড়া। একটা অন্ধকার রাস্তা
ধরে অনেকটা হেঁটে গেলাম। আরও যেতে ইচ্ছে
করছিল। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা বলে কথা। নামার সময়



দিব্বি নান্না যায়। ওঠার সময় দম বেরিয়ে যায়। তাই
নান্নার সময় মনে রাখতে হয়, এই পথেই আবার উঠে
আসতে হবে। কিছুদূর গিয়ে একটা পাথরের ওপর
অনেকক্ষণ আড্ডা। এবার সম্ভব পালা। সরকারি
কাজকর্ম থেকে পাড়ার রাজনীতি, নানা কথা উঠে
এল। মোটামুটি সবাই বাম মনস্ক। তবু বামদেবের
কী করা উচিত, তা নিয়ে একপ্রস্থ ভালই তর্ক হয়ে
গেল। কোন মিডিয়া কতখানি সমঝোতা করল, কোন
বুদ্ধিজীবী কেন বেসুরো গাইছে, নানা মত উঠে এল।

এই পাহাড়েও সিডিকেট, সারদা বা এসব আলোচনা থেকে নিস্তার নেই।

কাল শুরু করেছিলাম লাকপতের কথা দিয়ে। তারপর তার কথা আর বলাই হয়নি। লোকটা বেশ সরল। সব সময় মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। মাঝে মাঝেই ‘জি সাব’। আমরা সবাই ঠিক করলাম, সম্ভূকে বড়সাহেব বলে দেখাব। লাকপতের সামনে আমরাও সম্ভূকে ‘স্যার স্যার’ বলে ডাকতে লাগলাম। সম্ভূও গান্ধীর্ষ বজায় রেখে বুঝিয়ে দিল, চেহারায ছোটখাটোহলে কী হবে, সে সত্যিই হোমড়াচোমড়া। কিন্তু লাকপত এতসব থোড়াই বোঝে! তাকে যে কোনও খাবারের দাম জিজ্ঞেস করলে, সে কিছুক্ষণ পর বলবে ওয়ান ফিফটি। ভাত, ডাল, তরকারি, মাংস সবমিলিয়ে একটা মিলে কত পড়বে? তার জবাব ওয়ান ফিফটি। শুধু এক জায়গায় মাংস নিয়ে চার জায়গায় ভাগ করে নিলে কত পড়বে? উত্তর সেই

একটাই, ওয়ান ফিফটি। টিফিন বা স্ন্যাক্স? শুনে হোক, না শুনে হোক, উত্তর সেই ওয়ান ফিফটি। ভাগ্যিস, আর চায়ের দাম জিজ্ঞেস করিনি। তবে রান্নার হাতটা বেশ ভাল। বিশেষ করে মাংসটা। এমনকি দুপুরে যখন ডিমের কারি করছে, সেটাও চমৎকার। ডাল তো আছেই। এমন কিছু সবজি, যা সমতলে জোটে না। সবমিলিয়ে পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে বেশ ভালই লাগছে।

২ আগস্ট, বেলা ১১ টা

এবার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেল। আজ বেশ ভোরেই বেরিয়েছিলাম। বাগোড়া থেকে চার পাঁচ রকম রাস্তাচলে গেছে। সবগুলোতেই একটু একটু করে ঘোরা হয়ে গেছে। একটা রাস্তাই বাকি ছিল। ভোরের দিকে মনে হল, সেদিকটায় একটু হেঁটে আসি। আমরা আছি সাত হাজার ফুটেরও উপরে। বোধ হয় এখানটা দার্জিলিং থেকে উঁচুই হবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে

সোজা একটা রাস্তা চলে গেছে। কিছুদূর গিয়ে বুঝলাম, ওটা যাচ্ছে চটকপুরের দিকে। হাতে সময় থাকলে দিব্যি হেঁটে হেঁটেই চটকপুর চলে যাওয়া যেত। সম্ভব অবশ্য আসেনি। ওকে দু তিনবার তোলা হল। মুখটা দেখে খুব মায়া হল। মনে হল, ছেলেটা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন অনেকটা চলে গেছি, বেচারার জন্য বেশখারাপই লাগছিল। এত সুন্দর একটা দিক রয়েছে, বেচারী জানতেই পারল না! ঘন পাইন বন। রাতে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাটা ভেজা। একটু অন্ধকার অন্ধকার ভাব। এই অন্ধকার বলতে কাল একটা মজার কথা মনে পড়ল। বিকেলের দিকে রূপম ফোনে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। সে কথায় কথায় বলেছে, ‘সকালে যদিকে গিয়েছিলাম, রাস্তাটা পুরো অন্ধকার, সূর্যের আলোও ঢোকে না।’ বেশ রোমাঞ্চিত শোনাচ্ছিল মাস্টারমশাই কাম আলোকচিত্রীর গলা। কিন্তু কে জানত, অপর প্রান্ত থেকে এমন ধমক জুটবে! মাসিমা বলে দিলেন, ‘এত

অন্ধকারে যাওয়ার কী দরকার?’ রূপমের উচ্ছ্বাস তখন কিছুটা যেন চুপসে গেল। মায়ের আর দোষ কী? মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় ভাবসম্প্রসারণ আসত- ‘স্নেহের স্বভাবই এমন, অকারণ অনিষ্টের আশঙ্কা করে।’ ভোরে হাঁটতে গিয়েও বিভ্রাট। রূপম ছবি তুলছে। পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েছে দেবাশিস। পায়ের কাছেই একটা সাপ। দেখতে পেয়েই ভয়ে লাফিয়ে পড়ল দেবাশিস। ব্যালান্স রাখতে না পেরে পা-টা গিয়ে পড়ল সাপের মাথায়। দেবাশিস বেঁচে গেল। কিন্তু সাপটা অকালেই পর্যটকের হাতে প্রাণ দিল। মাথার জায়গায় যদি লেজে পা পড়ল, সাপ নির্ঘাত একটা ছোবল দিত। হয়ত তেমন বিষাক্ত ছিল না। তবু হাজার হোক, সাপ তো। তবে সাপ শুনে তোর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বর্ষার সময় দু একটা নিরীহ সাপ বেরোয়। পূজোর পর তারা দিব্য শীতঘুমে চলে যায়। রাস্তাটায় কিন্তু একেবারেই চড়াই উতরাই নেই। দিব্যি হেঁটে যাওয়া যায়। ফিরেও আসা যায়। ফেরার

সময় হয়ে এল। আবার নিশ্চয় আসব। কিন্তু সেবার
তো সম্ভব থাকবে না। ফলে, ফরেস্ট বাংলোও থাকবে
না। কিন্তু হোম স্টের ওই ডিকি আন্টি তো আছে।
পাহাড়, অরণ্য, নির্জনতা তো আছে। না হয় তার
টানেই আবার আসব।

চায়ের উপত্যকা পেরিয়ে কমলার বাগানে

কমলালেবুর গ্রাম বলতেই সবার আগে ভেসে ওঠে সিটংয়ের নাম। ঘরে ঘরে থরে থরে কমলালেবুর গাছ। ইচ্ছেমতো পেড়ে নিলেই হল। কমলালেবুর খোঁজে সিটং গিয়ে হতাশও হতে হয়েছে। কমলার সিজন না জানলে যা হয়! মার্চ, এপ্রিলে গেলে কি আর কমলালেবুর দেখা মেলে!

আবার উল্টোটাও হয়েছে। কমলালেবু দেখার কোনও সুদূরতম আশাও ছিল না। কিন্তু একের পর এক কমলার বাগান। ইচ্ছেমতো লেবু পেড়ে নেওয়ার হাতছানি। এটা অবশ্য সিটং নয়, তাবাকোশিতে। তাবাকোশি যাওয়া মূলত চা-বাগানের সান্নিধ্য পেতে। মিরিক পেরিয়ে ছোট



এক পাহাড়ি জনপদ। অলসভাবে দু-তিন দিন কাটানোর আদর্শ জায়গা। এখানে যে এমন কমলার বাগান আছে, কে ভেবেছিল!

এক বন্ধুর কাছে প্রথম শুনেছিলাম তাবাকোশির কথা। তবে সে কিন্তু কমলালেবুর কথা বলেনি। আসলে, সে কমলালেবু দেখেইনি। সে গিয়েছিল, এমন সময় যখন কমলালেবু হয় না। তাছাড়া সে

তাবাকোশিতে যত না সময় ছিল, তার থেকে বেশি ঘুরেছে আশপাশের জায়গায়। পুরীতে গিয়ে সবাই যা করে। আশপাশের উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কোনারক, নন্দন কানন এসবের চক্রে পড়ে আর পুরীটাই ঘোরা হয় না। তারও হয়ত তেমন দশাই হয়েছিল। আশপাশ ঘুরতে গিয়ে পায়ে হেঁটে তাবাকোশিটাই ঘোরা হয়নি। আমরা অবশ্য তাবাকোশি গিয়ে সেই ভুলটা করিনি। ঠিক করেই নিয়েছিলাম, নো সাইট সিন। অলসভাবে দুটো দিন তাবাকোশিতেই কাটাৰ।

মিরিক বলতে ছোটবেলায় দেখা মিরিক লেক। সে এক নষ্টালজিয়া। মনে আছে, প্রথম বোটিং করেছিলাম এই মিরিকেই। মনের মধ্যে একটা ছবি আঁকাই ছিল। কিন্তু সেই লেকের এ কী দশা! যেন এঁদো পুকুর। দেখেই আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না। অন্য সময় লেকটা বেশ সেজেই থাকে। বোটিং তো

আছেই, সেইসঙ্গে আছে ঘোড়ায় চড়ার হাতছানিও।
কিন্তু লকডাউনে পর্যটকের দেখা নেই বলেই হয়ত
সেভাবে সেজে ওঠেনি।

মিরিক ছাড়িয়ে আমরা সোজা চললাম তাবাকোশির
দিকে। মিরিক ছাড়াই উঁচু উঁচু পাইন গাছের
সারি। কোথাও মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথাও
হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসছে। দু পাশে ঢেউ খেলানো
চা-বাগান। প্রতিটি রাস্তার বাঁক যেন একেকটা ভিউ
পয়েন্ট। অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর ডানদিকে
একটা ঢালু রাস্তা নেমে গেছে। দু পাশে শুধু চায়ের
সাম্রাজ্য। এই পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া আরও বেশি
রোমাঞ্চকর। কিন্তু তখন তো ঠিকানায় পৌঁছতে
হবে। তাছাড়া গাড়িতে ব্যাগপত্তর কম ছিল না।
তাই হাঁটার রোমান্টিকতা মূলতুবি রেখে গাড়িতেই
বাকি পথটা পাড়ি দিতে হল।



অনেকটা পথ যাওয়ার
পর একটা পাহাড়ি
নদী। সেই নদী না
হয় পেরোলাম, এবার
দুদিকে দুটো রাস্তা
বঁকে গেছে। একটা
বাঁদিকে, একটা
ডানদিকে। কোনদিকে
যাব? চালক মশাইও

বেশ বিভ্রান্ত। এদিকে, জিজ্ঞেস করব, তারও উপায়
নেই। কারণ, ধারেপাশে কাউকে দেখাও যাচ্ছে
না। হোম স্টের মালিককে ফোন করে ডানদিকের
রাস্তাই নিলাম। গাড়িটা এসে থামল টি ভিলেজ
হোম স্টে—তে। আগামী দুদিন এটাই আমাদের
ঠিকানা। বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন বিজয় সুব্বা।
হোম স্টে তে ঢোকার আগেই একের পর এক
চমক। একেবারেই লাগোয়া চা বাগান। যে ঘরে

থাকার ব্যবস্থা, তার জানালা খুললেই চা-বাগান। অন্য সময় কিছুটা রুক্ষ মনে হবে। কিন্তু বর্ষায় তার চেহারাই আলাদা। বাড়ির লাগোয়া দারুণ এক বাগান। ফুল কপি থেকে মটরশুটি, পেলে থেকে কলা, বাঁধা কপি থেকে মুলো, সসা থেকে টমাটো। কী নেই সেই ছোট বাগানে। পরিচর্যার ছাপ স্পষ্ট। পাশেই একটা ছোট চৌবাচ্চার মতো জলাশয়। সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে রঙ বেরঙের মাছ।

দুপুরে খাওয়ারের মেনুও জিভে জল আনার মতোই। এমনিতে পাহাড়ের হোম স্টেতে একটা অলিখিত নিয়ম আছে। দিনে ডিম, রাতে চিকেন। কিন্তু বাঙালি গেস্ট দেখে বিজয়জি আগাম মাছের বন্দোবস্ত রেখেছিলেন। মাছে ভাতে বাঙালির জন্য মাছের অন্যরকম আয়োজন। তার কী নাম, জানা নেই। তবে খেতে বেশ। এমনিতে ভাত, ডাল, নানারকমের সবজি, চাটনি, পাপড়, বিচিত্র স্যালাড

— এসব তো ছিলই। সবমিলিয়ে অন্য সময় যা
খাওয়া হয়, তার থেকে অনেক বেশিই খাওয়া হয়ে
গেল।

যতই আসার ক্লাস্তি থাকুক। দুপুরে গড়িয়ে নেওয়ার
কোনও মানেই হয় না। কারণ, পাহাড়ে সন্দের পর
তেমন কিছুই করার থাকে না। তাই যেটুকু ঘোরার,
এই দুপুরেই ঘুরে নিতে হবে। বিজয়জির বাগানে
একটা কমলালেবুর গাছ দেখে কৌতূহল হল।
তিনি বললেন, একটা গাছ দেখেই এত এক্সাইটেড
হচ্ছেন। সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেলে হাজার
হাজার গাছ দেখতে পাবেন। বোকা বোকা প্রশ্নটা
করেই ফেললাম, লেবু পাওয়া যাবে? উনি হেসে
বললেন, হাজার হাজার গাছ মানে লক্ষ লক্ষ লেবু।
আমাদের রোমাঞ্চ তখন দেখে কে! ওই অবস্থাতেই
বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে বিজয়জির এক
আত্মীয়। তিনিই আমাদের গ্রাম ঘোরাতে নিয়ে



গেলেন। দেখলাম, বিজয়জি একটুও বাড়িয়ে বলেননি। সত্যিই, একেকটা ঘরে লেবু গাছের মিছিল। কিন্তু লোকের ঘরে ঢুকে লেবু পাড়া কি ঠিক হবে? এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই একের পর এক বাড়ি, একের পর এক বাগান পেরিয়ে গেলাম। শেষমেশ লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে একটা ঘরে ঢুকেই পড়লাম। মৃদু হেসে বললাম, আপনাদের লেবু বাগানে গিয়ে দু একটা লেবু নিতে পারি? তাঁরা পাল্টা হাসি উপহার দিয়ে বললেন, আপনারা

আমাদের গ্রামের অতিথি। একটা দুটো কেন, যত
খুশি পাড়ুন।

সেই আশ্বাস পেয়েই চলে এলাম বাগানের দিকে।
সাইজ একটু ছোট। কিন্তু হাজার হাজার লেবু ধরে
আছে গাছে। গাছের গায়ে হেলান দেওয়া সিঁড়ি
কাঠ যেমন আছে, তেমনি একজন এগিয়ে দিলেন
আঁকশি। অর্থাৎ, ইচ্ছমতো পেড়ে নিন। একের পর
এক লেবু পাড়ার পর্ব চলল। যখন ফিরে আসছি,
তখন দেখি আমাদের জন্য তাঁরা চা বানিয়ে
রেখেছেন। উঠোনেই চেয়ার পেতে দিলেন।
এমন আতিথেয়তা সত্যিই মন ছুঁয়ে যাওয়ার
মতো। তখনও আরও চমক বাকি ছিল। বেরিয়ে
আসার মুখে একজন ধরিয়ে দিলেন একটা থলি।
সেখানে কেজি খানেক লেবু তো আছেই। মানি
ব্যাগ বের করতে যাব, অমনি একজন নমস্কারের
ভঙ্গিতে বললেন, প্লিজ এটার দাম দেবেন না। এটা

আমাদের ছোট উপহার। আপনারা আমাদের থামে
ঘুরতে এসেছেন। এই লেবুগুলো তারই মেমেন্টো।

একরাশ কৃতজ্ঞতা আর মুক্ততা নিয়ে ফেরার রাস্তা
ধরলাম। দু পাশে ঘন চা বাগান মোড়া সেই রাস্তায়
একটু একটু করে বিকেল নামছে।

গোলপাহাড়ের দেশে যা, চা-পাহাড়ের দেশে যা

এ পথে আমি যে গেছি বারবার। সত্যিই, এই পথে
তো কমবার যাইনি। কখনও ওঠার সময়। কখনও
নামার সময়। দুপাশে পাইন গাছের সারি। দুদিকে
মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। আকদিকে আলতো পাহাড়।
অন্যদিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া চা-বাগান। কেমন
একটা হালকা অন্ধকারের আবহ।

কিন্তু এখানে কখনও থাকা হয়নি। অবশ্য, এই রাস্তায়
শেষবার গেছি বছর সাত-আট আগে। তখন এত
হোম স্টের রমরমা ছিল না। মিরিকে অনেক হোটেল
ছিল ঠিকই, কিন্তু ওই ঘিঞ্জি মিরিকে কখনই থাকার
ইচ্ছে হয়নি। বরং, সুখিয়াপোখরি হয়ে আরেকটু গিয়ে
লেপচা জগতে বেশ কয়েকবার থেকেছি। ওই রাস্তা

দিয়ে হেঁটে যাওয়াই যেন দারুণ এক রোমাঞ্চ। এক লহমায় সব বিরক্তি উধাও হয়ে যায়।

এবার আমাদের ঠিকানা ওকেটি। জায়গাটার নাম কয়েকদিন আগেও জানতাম না। নেটে সার্চ করলে হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু নামটা জানলে তবে তো সার্চ করবেন। নামটাই যদি না শোনা থেকে যায়, তবে কীভাবে সার্চ করবেন? জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিলেন তাবাকোশির বিজয় সুব্বা। প্রথমে তাঁর কাছেই উঠেছিলাম। এরপর কোথায় যাব, তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আরও একটু উপরের দিকে, নেপাল বর্ডারের কাছে দারুণ একটা গ্রাম আছে। ওকেটি। ওখানে চলে যান। চারপাশে চাবাগান আছে। ওয়েদার খুব ভাল। আর যে ছেলেটির কাছে পাঠাচ্ছি, সেই ছেলেটি আরও ভাল।

গাড়ি চলল মঞ্জেশীলা হোম স্টের দিকে। যাওয়ার



রাস্তাটাই চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো। রাস্তার যে কোনও বাঁকে নেমে যাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায়। মনে হবে, ক্যামেরার সব স্পেশ এখানেই শেষ করে দিই। এবার এল গোপালধারা টি এস্টেট। এর অবশ্য নাম শুনেছি। ড্রাইভার ভাই বলল, এটা একটা ভাল ভিউ পয়েন্ট। পরে এখানে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে আসবেন। দারুণ লাগবে। আমরা বললাম, এখন একটু ঘুরে নিলে হয় না! ড্রাইভার বলল, এখন নামলে এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করবে না।

ওদিকে দেরি হয়ে যাবে। পরে সময় নিয়ে ঘুরতে আসবেন।

পৌঁছে গেলাম মঞ্জেশীলা হোম স্টেতে। অবশ্য যাওয়ার পথে খুচরো একটা বিভ্রাট হয়েছিল। বাঁ দিকে হোম স্টে-র বোর্ডটটা চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে, অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। এদিকে, মোবাইলেও নেটওয়ার্ক নেই। ফলে, হোম স্টে মালিককে জিজ্ঞেস করতেও পারছি না। একটু একটু করে এগোতেই চলে এলাম নেপাল বর্ডার। এসেই যখন পড়েছি, এই সুযোগে পড়শি মূল্যকে একবার টুঁ মেরে আসাই যায়। নেপালের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা, মন্দ কী? সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁদের পাসপোর্টও নেই, বিদেশে যাওয়াও হয়নি। এই সুযোগে তাঁদের যদি এক রাউন্ড বিদেশ ভ্রমণ করিয়ে আনা যায়, সে তো আরও ভাল।

এদিকে, ততক্ষণে নেটওয়ার্ক এসে গেছে। হোম স্টে

থেকে মনোজ ভাই ফোন করে জানতে চাইলেন,
কোথায় আছি। বললাম, আমরা বোধ হয় হোম স্টে
পেরিয়ে এসেছি। এখন প্রতিবেশী দেশে। তিনি যেন
কিছুটা উদ্বিগ্ন। হওয়ারই কথা। তাঁর রান্নাবান্না রেডি।
আর অতিথিরা কিনা চলে গেছে নেপালে! তাঁকে
আশ্বস্ত করে বললাম, চিন্তা নেই, এই সুযোগে একবার
বিদেশ ভ্রমণ হয়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে
যাব। এবার আর খুঁজে নিতে কোনও সমস্যা হয়নি।

একমুখ হাসি নিয়ে আমাদের স্বাগত জানাতে
হাজির মনোজ তামাং। সামনে ছড়ানো লন। কাঠের
বেঞ্চ তৈরি করা। এখানে বসে শীতের রোদ গায়ে
মাখার আনন্দই আলাদা। লন থেকে সামনের দিকে
তাকালেই দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান। এই চা-বাগানের
চরিত্র অবশ্য একটু আলাদা। চা-পাহাড়ও বলা যায়।
অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড়। সবগুলো যেন একই
সাইজের। সেই পাহাড়গুলো চারদিক থেকে চা-গাছ

দিয়ে মোড়া। এমন হিসেব কষে, সাইজ মেপে পাহাড় তৈরি করা যায়! তাও প্রায় দেড়শো বছর আগে! ধন্য ইংরেজ জাতি। তোমাদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ। পাহাড়ে এলে এই জাতিটার প্রতি কেন জানি না শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। মনে হয়, এই জাতিটা আমাদের কাছ থেকে যা নিয়েছে, ফিরিয়ে দিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি। মানছি, ইংরেজরা আসার আগেও পাহাড়ে বিভিন্ন আদিম জনজাতির বসবাস ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা যেন তাতে নতুন করে প্রাণ এনে দিয়েছে। নইলে এই পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো, দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান তৈরি করা, এটা আমাদের কন্ম ছিল না।

ঘরে ঢুকতেই আরও বিস্ময়। মেঝে থেকে শুরু করে সব দেওয়াল পাইন কাঠে মোড়া। পরতে পরতে শিল্পের ছোঁয়া। বাইরেই পাইন কাঠের গুঁড়িকে এমনভাবে টেবিলের আদল দেওয়া হয়েছে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় উঠে



যাওয়া যায়। সেখানেও
চেয়ার টেবিল সাজানো।
বেশ কয়েকটা বড় বড়
জানালা, আর খোলা
বারান্দা। যার যেকোনো
মতি। কেউ চাইলে
সেখানে বসে পাতার
পর পাতা লিখে যেতে

পারেন। কেউ আপনমনে গান ধরতে পারেন। কেউ
ইচ্ছেমতো ফোনে বকবক করতে পারেন, কেউ
সুরাপাত্র সাজিয়ে জমিয়ে বসতে পারেন। যা করবেন,
কোনওটাই বেমানান মনে হবে না। রোদই উঠুক আর
বৃষ্টিই পড়ুক, ভোর হোক বা সন্ধ্যা, সবসময়ই মনে হবে
এর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না। বর্ষাকালে অনেকেই
পাহাড়কে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এই ওকেটিতে যাঁরা
আসবেন, বর্ষাঋতুর দিনটা তাঁদের কাছে অন্য এক
মাত্রা এনে দেবে। আপনিই তখন কালীদাস, মনে মনে

আপনি তখন কত মেঘদূত লিখে ফেলেছেন। রবি ঠাকুর এখানে কয়েক মাস থাকলে শুধু বর্ষার গান দিয়েই গীতবিতান ভরিয়ে দিতে পারতেন। আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। গুনগুন করে দু'চার লাইন গাইতে তো পারি।

কথায় বলে, আহাৰ ছাড়া বিহাৰ হয় না। এই বিহাৰ অবশ্য নীতীশ কুমারের বিহাৰ নয়, অভিধান ঘাটলে বিহাৰের একটা মানে হয় বেড়ানো। মনোজভাইয়ের স্ত্রী বিচিত্র সব পদ নিয়ে হাজির। বিচিত্র এক শাক, যা আমরা সমতলে পাই না। নামও শুনিনি। ব্রকোলি, ক্যাপসিকাম দিয়ে দারুণ এক তরকারি, স্যালাড, ভাজা, ডাল। সঙ্গে জিভে জল আনা ডিমের ঝোল। পাহাড়ের হোম স্টেতে মোটামুটি একটা অলিখিত নিয়ম আছে, দিনে ডিম, রাতে চিকেন। অন্যরকম চাইলে অবশ্য সে ব্যবস্থাও থাকে। বাইরে এলে ক্যালোরি মেপে খাওয়ার কোনও মানে হয় না। হাজার

চেপ্টা করলেও বাড়িতে ফিরে ওই ডিমের ঝোল বানানো যাবে না। এটা এদের হাতের জাদু। এদের হাতেই ভাল মানায়। কাজেই খাবার টেবিলে একটা দিন না হয় একটু বেহিসেবি হলেন।

তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে একটু গড়িয়ে নেওয়াই যায়। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে একটু পরেই বিকেল নেমে আসবে। আর পাহাড়ে সন্কে নেমে আসে ঝুপ করে। তখন আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। তখন গৃহবন্দি হয়ে যে যার মতো করে বিনোদন খুঁজে নেয়। কেউ সিরিয়ালে, কেউ আড্ডায়, কেউ গানে, কেউ পানে। তাই দুপুরটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। কুঁড়েমি তো সারাজীবনের জন্য পড়ে রইল। এই রাস্তায় একটু পায়ে না হাঁটলে তো আসাই বৃথা। পায়ে পায়ে সেই গোলপাহাড়ের ভিউ পয়েন্টে। পাহাড়ের সেরা গন্তব্যগুলোর একটা তো বলাই যায়। চারপাশে পাহাড়ের সারি। নিচের সরু রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন। ইচ্ছেমতো



ছোট্ট পাহাড়গুলোয়
উঠছেন। সেখান
থেকে নিচটা কী
চমৎকার দেখাচ্ছে!
যে কোনও একটা
পাহাড়ে উঠে মনে
হবে, এখানেই কয়েক

ঘণ্টা দিব্যি কাটিয়ে দিই। চা বাগান না চা-পাহাড় কী
বলবেন, সেটা আপনার হাতে। যতদূর চোখ যাবে,
শুধুই চা-গাছের ঢেউ। এমনই ব্যাপ্তি, চাইলে চা-
সমুদ্রও বলতে পারেন।

এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের মাঝে কোথাও
পাইন গাছের সীমানা। সারি সারি সেই গাছ যেন
সীমানা পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছের
গা ঘেঁসে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে হারিয়ে
যান। না, এর জন্য বিরাট কোনও কসরত করতে

হবে না। অল্পবিস্তর ভুঁড়ি নিয়েও দিব্যি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে পারেন। নইলে, দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমতল রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান। দু’দিকে চায়ের পাহাড়, মাঝখান দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন। একটা গানের শুটিং করতে কেন যে বাংলা ফিল্মের লোকেরা অকারণে দূরদেশে পাড়ি দেয়। দুই পাহাড়ের মাঝে হেঁটে যাওয়ার এই দৃশ্যপট বিদেশের যে কোনও লোকেশনকে হাসতে হাসতে দশ গোল দিতে পারে। এতে প্রোডিউসারের খরচ বাঁচে, জায়গাটারও প্রচার হয়। কিন্তু এই সহজ কথাটা শুটিং পার্টিকে কে বোঝায়!

একটা জায়গায় গিয়ে অনেকের মন বসে না। চরকির মতো সাইট সিয়িং-এ বেরিয়ে পড়েন। গাড়িওয়ালাদের চক্রে পড়ে ফাইভ পয়েন্ট, সেভেন পয়েন্ট ঘুরে আসেন। আমি অবশ্য কোনওকালেই এই পথের পথিক নই। বরং যে জায়গাটায় গেছি,

সেটাই বেশি করে পায়ে হেঁটে দেখতে যাই। পুরীর আশপাশ দেখতে গিয়ে পুরীটাই কত লোকের দেখা হয়নি। সারা দিন নন্দন কাননের চিড়িয়াখানা দেখেই পথিক ক্লান্ত। ফিরে এসে সমুদ্রটাই বেচারার দেখা হল না। পরের দিন ছুটল অন্য ঠিকানায়। সন্কেয় ফিরে যথারীতি ক্লান্ত। এভাবেই পুরীটা অদেখা থেকে যায়। দার্জিলিংয়ের স্কেট্রেও একই ঘটনা। ফাইভ পয়েন্ট, সেভেন পয়েন্টের চক্রে পড়ে পায়ে হেঁটে পর্যটকদের দার্জিলিংটাই ঘোরা হয় না। ঠিক তেমনি, গোলপাহাড়ের আশেপাশে ভাল জায়গার অভাব নেই। কিন্তু এটুকু মাথায় রাখুন, সেগুলো এই গোলপাহাড়ের চেয়ে বেশি সুন্দর নয়। তাহলে খামোখা অন্য দশ জায়গায় ছুটবেন কেন? যেখানে এসেছেন, সেখানটাই অলসভাবে ঘুরে দেখুন। তার রূপ, রস, গন্ধ পান করুন।

রাতে বেশ ভালই কাঁপুনি। বাইরে বসতে পারবেন না।

এমনকী বারান্দায়
খেতেও ইচ্ছে করবে
না। মনে হবে,
লেপের তলায় ঢুকে
পড়ি। কিন্তু পাহাড়ে
তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে
পড়লে মাঝরাতে
ঘুম ভেঙে যাওয়ার
আশঙ্কা। তার থেকে
কিছুক্ষণ জেগে
থেকে এই সুযোগে
মোবাইলে কোনও
সিনেমা দেখে



ফেলুন। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ঘুরে আসুন।
জ্যোৎস্না রাত হলে তো কথাই নেই। সেই সবুজ
আলোয় চায়ের পাহাড় যেন আরও সুন্দরী ও মোহময়ী
হয়ে উঠবে। দূরের পাহাড়ে সারি সারি আলো। মনে

হবে, রাতের তারাগুলো যেন মাটিতে নেমে এসেছে।

পাহাড়ের ভোর। সে এক অনাবিল আনন্দ। সাতসকালেই একমুখ হাসি নিয়ে হাজির মনোজ তামাং। বললেন, সামনের ওই পাহাড়টায় চলে যান। আজ ওয়েদার খুব ভাল। কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার দেখা যাবে। চটপট বেরিয়ে পড়লাম সেই পাহাড়ের দিকে। আলো ফুটছে, তবে তখনও সূর্যের দেখা নেই। কোথায় সূর্যোদয়। কিছুটা যেন হাল ছেড়ে দিয়েছি। তখনই লন থেকে মনোজভাইয়ের চিৎকার ভেসে এল, আর মিনিট পাঁচেক দাড়ান। সূর্য উঠবে। সূর্যের প্রথম আলো গিয়ে পড়বে কাঞ্চনজঙ্ঘায়। কথাটা হুবহু মিলে গেল। একটু পরেই সূর্যের আলো ঠিকরে এসে পড়ল সেই কাঞ্চনজঙ্ঘায়। অনেকটা রেঞ্জ যেন ধরা দিল আমাদের ক্যানভাসে। ক্ষণে ক্ষণে সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার রং বদলে গেল। কখনও হালকা লাল, কখনও বাদামি, কখনও গোলাপি। অবশেষে সেই শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা।

চোখের সামনে যা দেখছি, সব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।
এভাবে পরতে পরতে কাঞ্চনজঙ্ঘার রং বদলে যায়!

যেটুকু অপূর্ণতা ছিল, এক লহমায় তা ঢেকে দিল
ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘা। বেলার দিকে মনোজভাইয়ের
লন থেকেও ধরা দিল সেই শ্বেতশুভ্র পর্বতশৃঙ্গ। তবে
ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘার অনুভূতি পেতে গেলে চড়তে
হবে সেই ছোট্ট পাহাড়ে। ছোট্ট সফরে আর কী চাই!
প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গেল প্রাপ্তি। একটাই আক্ষেপ,
সুন্দর সফরটা কেন যে এত ছোট হল! পরেরবার
শুধু এখানেই আসব। অলসভাবে কাটিয়ে যাব
কয়েকটা দিন।



दाउलागिरी
DAWAIPANI

TABAQOSHI
ESTD 1960